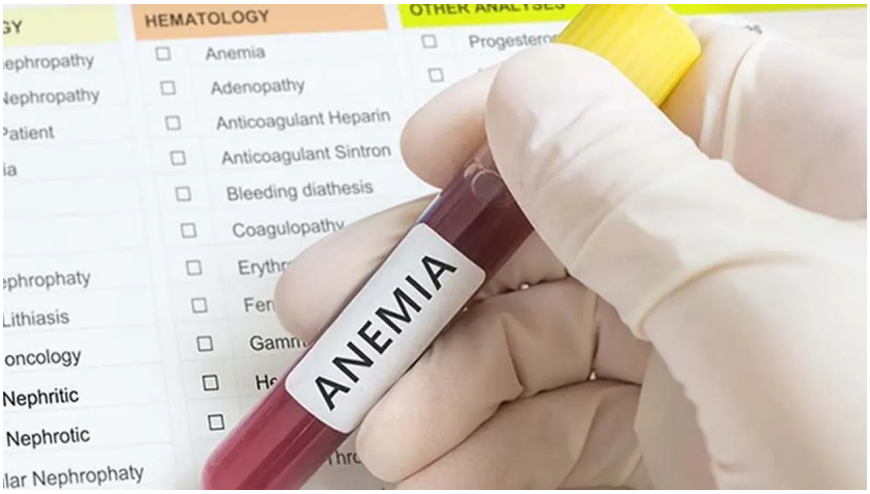
শিশুর দুর্বলতা অবহেলা নয়, রক্তশূন্যতা হতে পারে কারণ



সংগৃহীত ছবি

শিশুর ক্লান্তি, খিটখিটে মেজাজ বা খেলাধুলায় অনীহা সাধারণ বিষয় মনে হলেও এর পেছনে লুকিয়ে থাকতে পারে রক্তশূন্যতা। হিমোগ্লোবিন কমে গেলে শরীর প্রয়োজনীয় অক্সিজেন পায় না, আর দীর্ঘ সময় চিকিৎসা না হলে শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ব্যাহত হতে পারে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আয়রনের ঘাটতি ও কৃমি সংক্রমণ শিশুদের অ্যানিমিয়ার বড় কারণ।

শিশু হঠাৎ দুর্বল হয়ে পড়ছে, মনোযোগ ধরে রাখতে পারছে না, বা সারাক্ষণ ক্লান্ত লাগছে? এগুলোকে ছোটখাটো সমস্যা ভেবে এড়িয়ে যাওয়া বিপজ্জনক। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ডা. ফারাহ দোলা জানিয়েছেন, শিশুদের মধ্যেও রক্তশূন্যতা বা অ্যানিমিয়া বেশ সাধারণ সমস্যা।

রক্তশূন্যতা কী?

শুধু রক্তের পরিমাণ নয়, বরং হিমোগ্লোবিন নামক প্রোটিন বয়স ও লিঙ্গ অনুযায়ী কমে গেলে রক্তশূন্যতা ধরা পড়ে। হিমোগ্লোবিন শরীরের প্রতিটি অঙ্গে অক্সিজেন পৌঁছে দেয়, তাই এর ঘাটতিতে শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে।

শিশুদের রক্তশূন্যতার প্রধান কারণ

১. লোহিত রক্তকণিকার কম উৎপাদন – আয়রন, ফলিক অ্যাসিড বা ভিটামিন বি১২ ঘাটতিতে হয়।

২. রক্তকণিকা ভেঙে যাওয়া – হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়া বা থ্যালাসেমিয়ার মতো রোগে হয়।

৩. রক্তপাত – কৃমি, হিমোফিলিয়া বা অন্যান্য রক্তক্ষরণের কারণে হতে পারে।

কেন আয়রনের ঘাটতি বেশি দেখা যায়

আমাদের দেশে প্রিম্যাচিওর শিশু, জন্মের সময় কম ওজন, ছয় মাসের পরও শুধু বুকের দুধ খাওয়ানো, গরুর দুধের ব্যবহার ও কৃমি সংক্রমণ শিশুদের অ্যানিমিয়ার ঝুঁকি বাড়ায়।

লক্ষণ যেগুলো খেয়াল করবেন

ত্বক, ঠোঁট ও হাত-পায়ের তালু ফ্যাকাশে হওয়া

সবসময় ক্লান্ত ও দুর্বল বোধ করা

মাথা ঘোরা, বুক ধড়ফড়

মেজাজ খিটখিটে হয়ে যাওয়া

খেলাধুলা বা পড়াশোনায় অনীহা

শারীরিক বৃদ্ধি ও মনোযোগ কমে যাওয়া

কিছু ক্ষেত্রে জন্ডিস, পেট ফোলা, কালো প্রস্রাব বা শরীরে অস্বাভাবিক দাগও দেখা দিতে পারে।

করণীয় ও চিকিৎসা

ডাক্তারের পরামর্শে প্রয়োজনীয় রক্ত পরীক্ষা বা অন্যান্য পরীক্ষা করা

আয়রনের অভাব হলে ডাক্তার নির্দেশিত সিরাপ বা ট্যাবলেট দেওয়া

কলিজা, সবুজ শাক, ডিমের কুসুম, ফলমূলসহ আয়রনসমৃদ্ধ খাবার খাওয়ানো

৬ মাস বয়সের পর বুকের দুধের পাশাপাশি সুষম পরিপূরক খাবার দেওয়া

নিয়মিত কৃমির ওষুধ খাওয়ানো

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা

শিশুর দুর্বলতা বা আচরণগত পরিবর্তন অবহেলা না করে সময়মতো ব্যবস্থা নিলে অ্যানিমিয়া পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব। সুস্থ শিশু মানেই সুস্থ ভবিষ্যৎ—তাই অভিভাবকদের সচেতনতা সবচেয়ে জরুরি।